গণহত্যা বিষয়ক বই

Nelson Maldonado-Torres, *Against War: Views from the Underside of Modernity*, Duke University Press, 2008

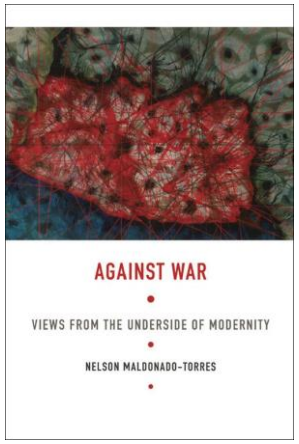

Nelson Maldonado-Torres রচিত *Against War: Views from the Underside of Modernity* (Duke University Press, 2008) সমকালীন উপনিবেশ-উত্তর দর্শন, সমালোচনামূলক তত্ত্ব এবং নৈতিক রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটি গভীর ও প্রভাবশালী গ্রন্থ। বইটি আধুনিকতা, যুদ্ধ, উপনিবেশবাদ এবং মানবতার ধারণার মধ্যে নিহিত সম্পর্ককে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে। বিশেষভাবে লেখক দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থাকে বোঝার জন্য যুদ্ধকে কেবল রাষ্ট্রের মধ্যকার সংঘর্ষ হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; বরং যুদ্ধ আধুনিকতার অন্তর্নিহিত ও স্থায়ী কাঠামো। আধুনিক সভ্যতা নিজেকে অগ্রগতি, যুক্তিবাদ এবং মানবাধিকারের বাহক হিসেবে উপস্থাপন করলেও, এর অন্তর্গত ভিত্তিতে রয়েছে ঔপনিবেশিক দখল, বর্ণবাদ, দাসপ্রথা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহিংসতা।

বইটির মূল তাত্ত্বিক অবস্থান হলো-আধুনিকতা ও যুদ্ধ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং ইউরোপীয় আধুনিকতার উত্থান ঘটেছে উপনিবেশ বিস্তার, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধ্বংস, আফ্রিকানদের দাসত্বে আবদ্ধকরণ এবং বর্ণভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু মানুষকে "পূর্ণ মানব" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদের "অমানবিক", "অসভ্য" বা "অধম" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে যুদ্ধ কেবল সামরিক সংঘর্ষ নয়; এটি এমন একটি সামাজিক ও দার্শনিক অবস্থা, যেখানে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনকে অবমূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়।

মালদোনাদো-তোরেস এই কাঠামোকে "প্যারাডাইম অব ওয়ার" বা যুদ্ধের প্যারাডাইম নামে অভিহিত করেছেন। এই প্যারাডাইমের বৈশিষ্ট্য

হলো–সন্দেহ, শত্রুতা, আধিপত্য এবং বর্জনের মানসিকতা। এর ফলে রাষ্ট্র, আইন, শিক্ষা, ধর্ম এবং দর্শন–সব ক্ষেত্রেই এমন এক নৈতিক যুক্তি তৈরি হয় যা ক্ষমতাবানদের আধিপত্যকে বৈধতা দেয়। লেখকের মতে, আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তার অনেক অংশে এই যুদ্ধকেন্দ্রিক যুক্তি সক্রিয়ভাবে কাজ করে এবং মানুষের মধ্যে মৌলিক সমতার ধারণাকে ক্ষুন্ন করে।

গ্রন্থটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো লেখকের "কলোনিয়ালিটি অব বিইং" (coloniality of being) ধারণার প্রয়োগ। এই ধারণা অনুযায়ী উপনিবেশবাদ শুধু ভূখণ্ড দখল বা অর্থনৈতিক শোষণের বিষয় নয়; এটি মানুষের অস্তিত্ব, আত্মপরিচয় এবং মানবিক মর্যাদাকেও প্রভাবিত করে। ঔপনিবেশিত মানুষের জীবন এমনভাবে গঠিত হয় যাতে তারা নিজেদেরকে অসম্পূর্ণ বা নিম্নতর বলে ভাবতে বাধ্য হয়। ফলে যুদ্ধের প্রভাব কেবল শারীরিক ধ্বংসে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং অস্তিত্বগত স্তরেও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে।

বইটিতে Emmanuel Levinas-এর নৈতিক দর্শনের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ গড়ে তোলা হয়েছে। লেভিনাস "অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা"কে নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে দেখালেও মালদোনাদো-তোরেস যুক্তি দেন যে উপনিবেশিক বাস্তবতার অভিজ্ঞতা বিবেচনায় না আনলে সেই নৈতিকতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য তিনি Frantz Fanon-এর উপনিবেশবিরোধী বিশ্লেষণ এবং Enrique Dussel-এর মুক্তির দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সংলাপের মাধ্যমে তিনি এমন এক নৈতিক কাঠামো নির্মাণ করেন যা নিপীড়িত মানুষের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে এবং মুক্তিকে নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

গ্রন্থটির একটি কেন্দ্রীয় ধারণা হলো "ডিকলোনিয়াল টার্ন" বা উপনিবেশ-উত্তর মোড়। এর মাধ্যমে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে আধুনিকতার প্রচলিত ইউরোকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা থেকে সরে এসে বিশ্বের প্রান্তিক ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের কেন্দ্রস্থলে আনতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞান, নৈতিকতা ও রাজনীতির নতুন ভিত্তি নির্মাণ করে। এখানে মানব মর্যাদা, পারস্পরিক স্বীকৃতি, সংহতি এবং ন্যায়বিচারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বইটির আলোচনায় যুদ্ধকে একটি দৈনন্দিন সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। বর্ণবাদ, দারিদ্র্য, দখলদারিত্ব, শরণার্থী সংকট, ইসলামোফোবিয়া এবং বৈশ্বিক বৈষম্য–এসবকেই লেখক যুদ্ধের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ যুদ্ধ কেবল অস্ত্রের সংঘর্ষ নয়; এটি এমন

এক কাঠামো যা কিছু মানুষের জীবনকে নিরাপদ ও মূল্যবান করে তোলে, আর অন্যদের জীবনকে অনিরাপদ ও অবমূল্যায়িত করে।

বইটির পদ্ধতিগত শক্তি হলো এর আন্তঃবিষয়ক চরিত্র। দর্শন, রাজনৈতিক তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, উপনিবেশ-উত্তর অধ্যয়ন এবং নৈতিক দর্শনের উপাদান একত্রিত করে লেখক একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। এর ফলে গ্রন্থটি শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সমকালীন বৈশ্বিক রাজনীতি ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

শৈলীর দিক থেকে বইটি অত্যন্ত গভীর ও তাত্ত্বিক। বিমূর্ত ধারণা, দার্শনিক পরিভাষা এবং জটিল যুক্তিনির্মাণের কারণে বিষয়টির সঙ্গে অপরিচিত পাঠকদের জন্য এটি কিছুটা কঠিন হতে পারে। তবে যারা সমালোচনামূলক তত্ত্ব, উপনিবেশ-উত্তর দর্শন এবং নৈতিক রাজনৈতিক চিন্তায় আগ্রহী, তাদের জন্য এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্য।

সমালোচনামূলকভাবে বলা যায়, গ্রন্থটি তাত্ত্বিক গভীরতায় অসাধারণ হলেও কিছু ক্ষেত্রে বাস্তব রাজনৈতিক কৌশল বা প্রয়োগধর্মী দিক তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হয়েছে। তবুও বইটির মৌলিক অবদান হলো আধুনিকতার নৈতিক সংকটকে যুদ্ধ ও উপনিবেশবাদের সঙ্গে যুক্ত করে একটি শক্তিশালী বিকল্প চিন্তার ভিত্তি নির্মাণ করা।

সার্বিকভাবে, *Against War: Views from the Underside of Modernity* আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার সহিংস ভিত্তি উন্মোচনকারী একটি অসাধারণ ও চিন্তাপ্রবণ গ্রন্থ। এটি দেখায় যে যুদ্ধ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং আধুনিকতার অন্তর্গত নৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো। একই সঙ্গে বইটি মুক্তি, সংহতি এবং মানব মর্যাদার ভিত্তিতে একটি ডিকলোনিয়াল নৈতিকতার আহ্বান জানায়। উপনিবেশবাদ, যুদ্ধ, গণহত্যা, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার বিষয়ক গবেষকদের জন্য এই বইটি বিশেষভাবে মূল্যবান এবং সমকালীন চিন্তাচর্চায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

Filip Reyntjens, *Rwanda before the Genocide: Catholic Politics and Ethnic Discourse in the Late Colonial Era,* University of Wisconsin Press, 2013

Filip Reyntjens রচিত *Rwanda before the Genocide: Catholic Politics and Ethnic Discourse in the Late Colonial Era* (University of Wisconsin Press, 2013) রুয়ান্ডার ইতিহাস, গণহত্যা অধ্যয়ন এবং উপনিবেশ-উত্তর রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বইটি ১৯৯৪ সালের রুয়ান্ডা গণহত্যার পটভূমি বোঝার জন্য ঔপনিবেশিক শাসন, ক্যাথলিক চার্চ এবং জাতিগত পরিচয় নির্মাণের জটিল সম্পর্ককে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছে। লেখক দেখিয়েছেন যে হুতু ও তুতসি পরিচয় কোনো চিরন্তন বা স্বাভাবিক সামাজিক বিভাজন ছিল না; বরং ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় হস্তক্ষেপে এই পরিচয়গুলোকে রাজনৈতিকভাবে নির্মাণ, কঠোরীকরণ এবং ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

বইটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হলো, রুয়ান্ডায় জাতিগত দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ইতিহাসগতভাবে নির্মিত। ঔপনিবেশিক যুগের পূর্বে হুতু ও তুতসি পরিচয় ছিল অপেক্ষাকৃত নমনীয় সামাজিক শ্রেণি, যা মূলত অর্থনৈতিক অবস্থা, পেশা ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিক শাসন এবং ক্যাথলিক মিশনারিদের কার্যক্রম এই পরিচয়গুলোকে স্থির ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জাতিগত শ্রেণিতে রূপান্তরিত করে। এর ফলে সামাজিক গতিশীলতা কমে যায় এবং জাতিগত পার্থক্য রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

রেইনটজেন্স বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে ক্যাথলিক চার্চ শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেনি; এটি রুয়ান্ডার রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল। মিশনারিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক এবং মতাদর্শিক প্রচারের মাধ্যমে সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাথমিক পর্যায়ে চার্চ তুতসি অভিজাতদের সমর্থন করেছিল, কারণ তাদেরকে প্রশাসনিকভাবে দক্ষ ও শাসনের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চার্চ হুতু সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি সমর্থন স্থানান্তর করে। এই পরিবর্তন রুয়ান্ডার রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করে।

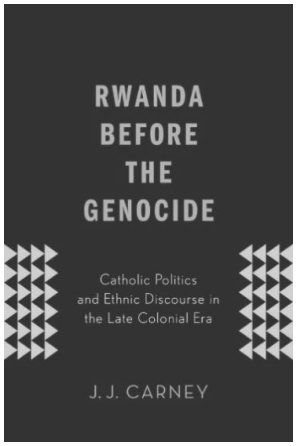

চার্চের এই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে "হুতু মুক্তি" (Hutu emancipation) ধারণা রাজনৈতিক শক্তিতে রূপ নেয়। সামাজিক ন্যায়বিচারের ভাষায় উপস্থাপিত এই আন্দোলন ক্রমে জাতিগত জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। তুতসিদের ঐতিহাসিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে

রাজনৈতিক প্রতিবাদ ধীরে ধীরে এমন মতাদর্শ তৈরি করে, যেখানে তুতসিদের জাতীয় শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। লেখক দেখিয়েছেন যে এই মতাদর্শই পরবর্তী দশকগুলোতে ঘৃণা, বর্জন এবং সহিংসতার ভিত্তি তৈরি করে।

গ্রন্থটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো "জাতিগত ভাষ্য" (ethnic discourse) ধারণার বিশ্লেষণ। লেখক ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে ধর্মীয় বক্তৃতা, রাজনৈতিক দলিল, শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক নীতিমালার মাধ্যমে জাতিগত পরিচয়কে নতুন অর্থ প্রদান করা হয়। "অধিকার", "সংখ্যাগরিষ্ঠ", "বৈধ প্রতিনিধিত্ব" এবং "ঐতিহাসিক অবিচার"– এর মতো ধারণাগুলো জাতিগত রাজনীতিকে বৈধতা দিতে ব্যবহৃত হয়। এই ভাষ্য সামাজিক বাস্তবতাকে এমনভাবে নির্মাণ করে যে জাতিগত বিভাজনকে স্বাভাবিক ও অনিবার্য বলে মনে হতে থাকে।

বইটিতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, চার্চ এবং উদীয়মান রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রেইনটজেন্স দেখিয়েছেন যে প্রশাসনিক ক্ষমতা, ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং রাজনৈতিক সংগঠন একে অপরকে শক্তিশালী করেছে। এর ফলে রুয়ান্ডার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জাতিগত পরিচয় ক্ষমতা অর্জনের প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে। এই কাঠামোই স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যকে স্থায়ী করে তোলে।

লেখক ১৯৫৯ সালের "সামাজিক বিপ্লব" (Social Revolution)-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সময়ে হুতু নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসে এবং তুতসিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সহিংসতা ও বাস্তুচ্যুতি ঘটে। হাজার হাজার তুতসি প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রেইনটজেন্সের মতে, এই ঘটনাই পরবর্তী কয়েক দশকে জাতিগত শত্রুতা, নির্বাসিত তুতসিদের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং অবশেষে ১৯৯৪ সালের গণহত্যার ভিত্তি স্থাপন করে।

গ্রন্থটির একটি মৌলিক অবদান হলো রুয়ান্ডা গণহত্যাকে আকস্মিক বিস্ফোরণ হিসেবে নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা। লেখক দেখিয়েছেন যে গণহত্যা বোঝার জন্য কেবল রাজনৈতিক সংকট বা গৃহযুদ্ধ বিশ্লেষণ করলেই যথেষ্ট নয়; বরং পরিচয় নির্মাণ, মতাদর্শিক বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠানগত ভূমিকা বোঝা অপরিহার্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি গণহত্যা অধ্যয়নে কাঠামোগত ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের গুরুত্বকে জোরদার করে।

পদ্ধতিগতভাবে বইটি ঐতিহাসিক দলিল, রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং প্রশাসনিক নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে রচিত। লেখকের বিশ্লেষণ সুসংগঠিত, তথ্যসমৃদ্ধ এবং ব্যাখ্যামূলকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে তাঁর

আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এটি দেখায় যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কখনো কখনো ন্যায়বিচারের ভাষা ব্যবহার করেও বিভাজনমূলক রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে পারে।

তবে সমালোচনামূলকভাবে বলা যায়, বইটির প্রধান মনোযোগ অভিজাত রাজনৈতিক ভাষ্য প্রতিষ্ঠানগত গতিশীলতার ওপর কেন্দ্রীভূত। ফলে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, স্থানীয় সামাজিক সম্পর্ক এবং দৈনন্দিন প্রতিরোধের বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হয়েছে। তবুও এই সীমাবদ্ধতা বইটির সামগ্রিক গুরুত্বকে খর্ব করে না।

সার্বিকভাবে, *Rwanda before the Genocide* রুয়ান্ডার গণহত্যার ঐতিহাসিক শিকড় অনুসন্ধানে একটি অনন্য ও অপরিহার্য গ্রন্থ। এটি দেখায় যে জাতিগত পরিচয় স্বতঃসিদ্ধ নয়; বরং রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং ঔপনিবেশিক শক্তির মাধ্যমে নির্মিত বাস্তবতা। ক্যাথলিক চার্চ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং জাতিগত মতাদর্শের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বইটি গণহত্যার দীর্ঘমেয়াদি পটভূমি বোঝার জন্য অসাধারণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। রুয়ান্ডার ইতিহাস, ধর্ম ও রাজনীতি, উপনিবেশবাদ এবং গণহত্যা অধ্যয়নের গবেষকদের জন্য এই বইটি একটি মৌলিক ও অপরিহার্য পাঠ্য।

John K. Roth, *Holocaust: Religious and Philosophical Implications*, Paragon House, 1989

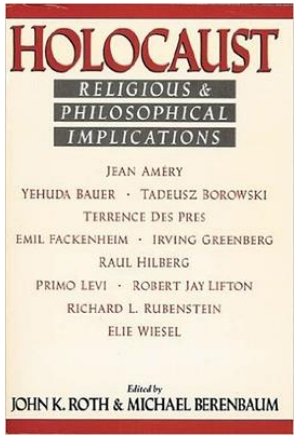

John K. Roth রচিত *Holocaust: Religious and Philosophical Implications* (Paragon House, 1989) হলোকাস্ট অধ্যয়ন, ধর্মীয় দর্শন এবং নৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি গভীর ও প্রভাবশালী গ্রন্থ। বইটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় The Holocaust যে অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল, তার ধর্মীয়, নৈতিক এবং দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে। লেখক দেখিয়েছেন যে হলোকাস্ট কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; এটি মানবসভ্যতার নৈতিক ভিত্তি, ঈশ্বরবিশ্বাস, মানব প্রকৃতি এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলোকেই মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

বইটির মূল বক্তব্য হলো, হলোকাস্টের মতো ব্যাপক গণহত্যা ঈশ্বর, মন্দ, কষ্ট এবং মানব দায়বদ্ধতা সম্পর্কে প্রচলিত ধর্মীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যাকে গভীর সংকটে ফেলে। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের সংগঠিত নিধন এমন প্রশ্ন উত্থাপন করে– যদি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও ন্যায়পরায়ণ হন, তবে এই ধরনের ভয়াবহতা কীভাবে সম্ভব হলো? ঈশ্বর কি নীরব ছিলেন, অনুপস্থিত ছিলেন, নাকি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে? রথ এই প্রশ্নগুলোর সহজ উত্তর দেন না; বরং তিনি দেখান যে হলোকাস্ট-পরবর্তী যুগে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে।

গ্রন্থটির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো problem of evil। ঐতিহ্যগত ধর্মতত্ত্বে মানবদুঃখকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা, শাস্তি বা পরীক্ষার অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু হলোকাস্টের পরিকল্পিত নিষ্ঠুরতা এসব ব্যাখ্যার নৈতিক সীমাবদ্ধতা উন্মোচিত করে। রথ যুক্তি দেন যে এত ব্যাপক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যাযজ্ঞের পর প্রচলিত ব্যাখ্যা অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমালোচনামূলকভাবে পুনর্মূল্যায়ন করা জরুরি হয়ে ওঠে।

লেখক ঈশ্বরের ন্যায়বিচার (theodicy) সম্পর্কিত বিতর্ককে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে হলোকাস্টের পর অনেক চিন্তাবিদ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা, কল্যাণময়তা এবং ইতিহাসে ঈশ্বরের সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ ঈশ্বরের ধারণাকে পুনর্গঠন করেছেন, কেউ বিশ্বাসে সংশয় প্রকাশ করেছেন, আবার কেউ ধর্মীয় ভাষাকেই পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন। এই আলোচনার মাধ্যমে বইটি ধর্মীয় চিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়কে তুলে ধরে।

বইটিতে মানব দায়িত্বের প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রথ দেখিয়েছেন যে গণহত্যা কেবল কয়েকজন নেতার সিদ্ধান্তের ফল নয়; এটি আমলাতন্ত্র, প্রযুক্তি, সামাজিক উদাসীনতা এবং নৈতিক ব্যর্থতার সমষ্টিগত পরিণতি। নাৎসি অপরাধীদের পাশাপাশি নীরব দর্শক, সহযোগী এবং উদাসীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকাও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। এর ফলে বইটি নৈতিক প্রশ্ন তোলে-অন্যায়ের মুখে নীরব থাকা কি নিজেই একটি নৈতিক অপরাধ নয়?

হলোকাস্টের এর স্মৃতি সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যার নৈতিক গুরুত্বও বইটির একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। লেখকের মতে, হলোকাস্টকে স্মরণ করা শুধু অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়; এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি নৈতিক দায়িত্ব। স্মৃতি মানুষকে সতর্ক করে দেয় যে সভ্যতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিষ্ঠুরতা কত দ্রুত সক্রিয় হতে পারে। সেই কারণে ইতিহাস, শিক্ষা এবং স্মৃতিচর্চা গণহত্যা প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

গ্রন্থটির আরেকটি শক্তিশালী দিক হলো এর আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস এবং নৈতিক চিন্তাকে একত্রিত করে রথ দেখিয়েছেন যে হলোকাস্টের তাৎপর্য বোঝার জন্য একক কোনো শাস্ত্র যথেষ্ট নয়। মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত এমন অপরাধ বিশ্লেষণে বহুমাত্রিক পদ্ধতি অপরিহার্য। এই কারণে বইটি গবেষক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে মূল্যবান।

বইটি জটিল নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন আলোচিত হওয়ায় তাত্ত্বিক আলোচনা-অপরিচিত পাঠকদের কাছে কিছু অংশ কঠিন মনে হতে পারে। তবে লেখকের যুক্তি সুসংগঠিত এবং প্রতিটি অধ্যায় পাঠককে মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। যারা ধর্ম, নৈতিকতা ও গণহত্যার সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে চান, তাদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য।

সমালোচনামূলকভাবে বলা যায়, বইটির প্রধান জোর দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণের ওপর। ফলে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ, বেঁচে থাকা মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক বাস্তবতার বিশদ বিবরণ তুলনামূলকভাবে কম স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা বইটির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ এর লক্ষ্য মূলত হলোকাস্টের বৌদ্ধিক ও নৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করা।

সার্বিকভাবে, *Holocaust: Religious and Philosophical Implications* হলোকাস্ট-পরবর্তী ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি দেখায় যে গণহত্যা শুধু মানবিক বিপর্যয় নয়; এটি ঈশ্বর, ন্যায়, মানবতা এবং নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের মৌলিক বিশ্বাসকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। গভীর দার্শনিক বিশ্লেষণ, আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নৈতিক সংবেদনশীলতার জন্য বইটি হলোকাস্ট স্টাডিজ, ধর্মীয় দর্শন, নৈতিক তত্ত্ব এবং গণহত্যা গবেষণায় একটি অপরিহার্য ও দীর্ঘস্থায়ী অবদান।

ডা. এম এ হাসান, *একাত্তরের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ*, তাম্রলিপি, ২০১০

ডা. এম এ হাসান রচিত *একাত্তরের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ* (তাম্রলিপি, ২০১০) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধবিষয়ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। বইটিতে ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনি এবং তাদের স্থানীয় সহযোগীদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ এবং নারীর ওপর সংঘটিত ব্যাপক যৌন সহিংসতার বিশদ বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক ঐতিহাসিক দলিল, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, সংবাদ প্রতিবেদন

এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি কেবল একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল না; এটি ছিল পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত একটি গণহত্যা।

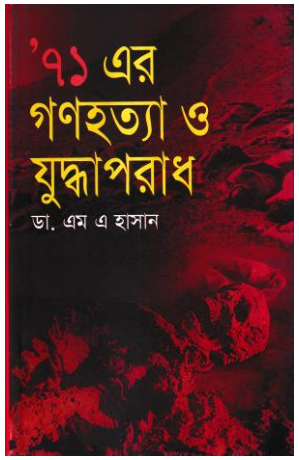

বইটির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হলো, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা পূর্ববাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে দমন করতে যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, তা আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে সুস্পষ্টভাবে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের অন্তর্ভুক্ত। ২৫ মার্চের Operation Searchlight-এর মাধ্যমে ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, হিন্দু সম্প্রদায় এবং সাধারণ নিরস্ত্র মানুষের ওপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। লেখক দেখিয়েছেন যে এই অভিযান ছিল পূর্বপরিকল্পিত, সংগঠিত এবং জাতিগত-রাজনৈতিকভাবে লক্ষ্যনির্ধারিত।

গ্রন্থটিতে গণহত্যার বিভিন্ন মাত্রা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি লক্ষাধিক নারীর ওপর সংঘটিত ধর্ষণকে লেখক যুদ্ধের কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রাম পোড়ানো, সম্পদ লুট, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বিশেষ আক্রমণ এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির ঘটনাও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণ দেখায় যে সহিংসতার লক্ষ্য ছিল কেবল সামরিক বিজয় অর্জন নয়; বরং বাঙালি জাতিসত্তার মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং সামাজিক কাঠামো ধ্বংস করা।

বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্থানীয় সহযোগী বাহিনি-রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস এর ভূমিকার বিশ্লেষণ। লেখক দেখিয়েছেন যে পাকিস্তানি বাহিনির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই গোষ্ঠীগুলো গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ, ধরপাকড়, নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিশেষত ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে আল-বদরের ভূমিকা বইটিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে লেখক দায়বদ্ধতার প্রশ্নকে কেন্দ্রে নিয়ে আসেন এবং বিচার প্রতিষ্ঠার নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

গ্রন্থটিতে আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে। United Nations-এর গণহত্যা সনদ, মানবতাবিরোধী অপরাধের

সংজ্ঞা এবং যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে লেখক দেখিয়েছেন যে ১৯৭১ সালের অপরাধসমূহ আন্তর্জাতিক বিচার কাঠামোর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বিশ্লেষণ বইটিকে শুধু ঐতিহাসিক বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং আইনগত ও নৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে বিচার দাবিকে শক্তিশালী করেছে।

লেখক সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও দুর্ভোগকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামীণ জনপদে হত্যাযজ্ঞ, শরণার্থী সংকট, নারীর মানসিক ও সামাজিক ট্রমা এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বইটিতে গভীর সহমর্মিতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রায় এক কোটি মানুষের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ এবং অসংখ্য পরিবারে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস ও স্মৃতিচর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আলোচিত হয়েছে।

বইটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্মৃতি ও জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্ন। লেখকের মতে, ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে সঠিকভাবে নথিবদ্ধ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা কেবল ইতিহাসচর্চার কাজ নয়; এটি ন্যায়বিচার ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষার অপরিহার্য দায়িত্ব। সত্য প্রতিষ্ঠা, শহিদদের স্মরণ এবং অপরাধীদের বিচারের মধ্য দিয়েই জাতি তার নৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে।

পদ্ধতিগতভাবে বইটি তথ্যসংগ্রহ ও দলিলভিত্তিক উপস্থাপনার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক বিপুল পরিমাণ ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করে বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরেছেন। গবেষণামূলক এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ক সাহিত্যে একটি শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ১৯৭১ সালের স্বীকৃতি আন্দোলনকে বৌদ্ধিক সমর্থন জুগিয়েছে।

সমালোচনামূলকভাবে বলা যায়, বইটির ধান শক্তি তথ্য ও দলিলসমৃদ্ধ উপস্থাপনায়। তবে তুলনামূলক গণহত্যা তত্ত্ব, আন্তর্জাতিক গবেষণার সঙ্গে বিস্তৃত সংলাপ এবং আরও কাঠামোগত বিশ্লেষণ যুক্ত হলে এর একাডেমিক অবদান আরও সমৃদ্ধ হতে পারত। তবুও এই সীমাবদ্ধতা বইটির ঐতিহাসিক ও নৈতিক গুরুত্বকে কোনোভাবেই খর্ব করে না।

সার্বিকভাবে, একাত্তরের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নৃশংসতা, মানবিক বিপর্যয় এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্নকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। এটি প্রমাণ করে যে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি ছিল পরিকল্পিত গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের সুস্পষ্ট উদাহরণ। দলিলসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ, নৈতিক অবস্থান এবং বিচার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় আহ্বানের

কারণে বইটি মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা, গণহত্যা অধ্যয়ন, আন্তর্জাতিক আইন এবং বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে আগ্রহী গবেষক ও পাঠকদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটে গণহত্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮

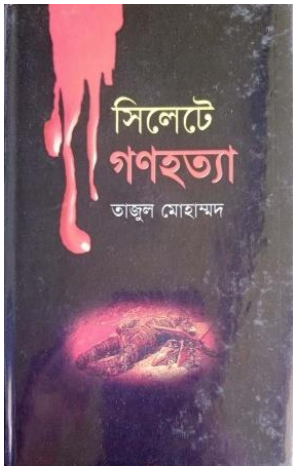

তাজুল মোহাম্মদ রচিত *সিলেটে গণহত্যা* (সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আঞ্চলিক গণহত্যা গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অসামান্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ। বইটিতে ১৯৭১ সালে সিলেট অঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি এবং তাদের দেশীয় দোসরদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিস্তৃত দলিলভিত্তিক বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন যে সিলেটের সহিংসতা বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল সমগ্র বাংলাদেশে পরিচালিত পরিকল্পিত গণহত্যা অভিযানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বইটির প্রধান বক্তব্য হলো, সিলেট অঞ্চলে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ একটি সুসংগঠিত দমননীতি ও গণহত্যার অংশ, যার লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দমন করা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়া এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর, বাজার, গ্রাম এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে অসংখ্য নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়, আওয়ামী লীগ-সমর্থক, ছাত্রনেতা, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাকারীরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।

গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো লেখকের বিস্তৃত মাঠপর্যায়ের গবেষণা। তাজুল মোহাম্মদ সিলেটের বিভিন্ন উপজেলা, গ্রাম, যুদ্ধক্ষেত্র ও গণকবর পরিদর্শন করে প্রত্যক্ষদর্শী, মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় ইতিহাস-সংরক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই দীর্ঘ গবেষণা-ভ্রমণের ফলে অসংখ্য ছোট-বড় যুদ্ধ, গণহত্যা এবং প্রতিরোধের কাহিনি বইটিতে জীবন্ত হয়ে

উঠেছে। প্রতিটি অধ্যায়ে স্থানীয় ইতিহাস, মানবিক বেদনা এবং মুক্তিযুদ্ধের সাহসিকতা গভীর আবেগ ও তথ্যনিষ্ঠতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।

বইটিতে সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গণহত্যার স্থান ও যুদ্ধের বর্ণনা বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে গণহত্যা, চা-বাগান এলাকায় শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন, সীমান্তবর্তী এলাকায় সামরিক অভিযান এবং সাধারণ মানুষের বাস্তুচ্যুতি বইটির আলোচনায় বিশেষ স্থান পেয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন যে সিলেটের ভূগোল–পাহাড়, হাওর, চা-বাগান এবং ভারতীয় সীমান্ত-যুদ্ধের কৌশল ও প্রতিরোধ আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

স্থানীয় সহযোগী বাহিনি–রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস এর ভূমিকার বিশ্লেষণ বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। লেখক তুলে ধরেছেন, কীভাবে এসব গোষ্ঠী পাকিস্তানি বাহিনিকে তথ্য সরবরাহ, সন্দেহভাজনদের শনাক্তকরণ, আটক, নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করেছে। এই সহযোগিতা সহিংসতার মাত্রা বাড়িয়ে তোলে এবং বহু অঞ্চলে গণহত্যাকে আরও সুসংগঠিত করে। ফলে বইটি কেবল বাহ্যিক সামরিক দমন নয়, অভ্যন্তরীণ সহযোগিতার রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রশ্নও সামনে আনে।

গ্রন্থটির মানবিক শক্তি নিহিত রয়েছে ভুক্তভোগী ও বেঁচে থাকা মানুষের অভিজ্ঞতার বর্ণনায়। অসংখ্য পরিবার স্বজন হারিয়েছে, গ্রাম ধ্বংস হয়েছে, নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। লেখক এসব অভিজ্ঞতাকে পরিসংখ্যানের আড়ালে হারিয়ে যেতে দেননি; বরং ব্যক্তিগত স্মৃতি ও স্থানীয় সাক্ষ্যের মাধ্যমে ইতিহাসকে মানবিক মুখ দিয়েছেন। এর ফলে বইটি একই সঙ্গে গবেষণামূলক এবং গভীরভাবে আবেগঘন।

বইটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসে অনেক স্থানীয় গণহত্যা ও প্রতিরোধের ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে লেখক দেখায় যে জাতীয় গণহত্যার পূর্ণাঙ্গ চিত্র বুঝতে হলে প্রতিটি অঞ্চলের ইতিহাসকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। সিলেটের ঘটনাবলি ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি অপরিহার্য অংশ।

পদ্ধতিগতভাবে বইটি দলিল, সাক্ষাৎকার, স্থানীয় স্মৃতিচর্চা এবং মাঠগবেষণার সমন্বয়ে নির্মিত। এই পদ্ধতি গবেষণাটিকে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করেছে এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য একটি মূল্যবান উৎস তৈরি করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে ইতিহাস সংগ্রহের ক্ষেত্রে লেখকের ধৈর্য ও নিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

সমালোচনামূলকভাবে বলা যায়, বইটির সবচেয়ে বড় শক্তি তথ্যসংগ্রহ ও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের ব্যবহার। তবে তুলনামূলক গণহত্যা তত্ত্ব, আন্তর্জাতিক গবেষণার সঙ্গে সংলাপ এবং আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো যুক্ত হলে এর একাডেমিক গভীরতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারত। তবুও এই সীমাবদ্ধতা বইটির মৌলিক গুরুত্ব কমায় না।

সার্বিকভাবে, *সিলেটে গণহত্যা* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, গণহত্যা নথিবদ্ধকরণ এবং স্মৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান। তাজুল মোহাম্মদের পরিশ্রমী গবেষণায় সিলেটের শহিদ, মুক্তিযোদ্ধা এবং নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

রিয়াদ হোসেন

গণহত্যা জাদুঘর সংগ্রহ থেকে

শহিদ বুদ্ধিজীবী সিরাজুদ্দীন হোসেনের পাঞ্জাবি ও পায়জামা

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শালিখা থানার শরুশুনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শহিদ বুদ্ধিজীবী সিরাজউদ্দীন হোসেন। সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর বার্তা ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক। এ দেশের সংবাদপত্র জগতের অন্যতম পুরোধা ছিলেন তিনি। পাকিস্তান আমলে যে কয়জন সাংবাদিকের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি অধিকৃত ঢাকায় ইত্তেফাকে দুঃসাহসিক সম্পাদকীয় লেখেন, মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা দেন এবং অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সংবাদ সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকারের কাছে নিয়মিত প্রেরণ করেন। তিনি প্রবাসী সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের আমেরিকান কনস্যুলেটের গোপন প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছিলেন, যা পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বারবার প্রচারিত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে উঠতে সাহায্য করে। যুদ্ধের সময় সিরাজুদ্দীন হোসেন *'ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়'* নামে একটি উপ-সম্পাদকীয় লেখেন যেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, যে দোষে শেখ মুজিবকে দোষী বলা হচ্ছে, পশ্চিমা রাজনীতিকরা সেই একই দোষে দুষ্ট। এ সময় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মুখপাত্র *'দৈনিক সংগ্রাম'*-এ 'অতএব ঠগ বাছিও না' নামে একটি উপ সম্পাদকীয় লিখে তাঁকে পরোক্ষভাবে মৃত্যুর হুমকি দেয়। কিন্তু এসব হুমকি তাঁর কলমকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি এবং তাদের এদেশীয় দোসর আল বদর বাহিনির সদস্যরা তাঁকে তাঁর শান্তিনগর, চামেলীবাগের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়।